guruchandali.com

তপন সিংহ – যে জন আছেন মাঝখানে...! - শুভময় সরকার

বাংলা সিনেমার তথা ভারতীয় সিনেমায় Trio-র প্রথম নামটি অনিবার্যভাবে সত্যজিৎ রায় এবং বাকি দু'জন মৃনাল সেন ও ঋত্বিক কুমার ঘটক।এই তিনজনকে নিয়ে আলোচনা করতে বাঙালি যতটা স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ বোধ করে, তেমনটাই করে খুব জনপ্রিয় বাণিজ্যসফল অতি বাজে, বাজে এবং মাঝারি মানের ছবিগুলোকে নিয়েও । বিষয়টা একটু খোলসা করেই বরং বলা যাক । ওই প্রথম ত্রয়ীর সিনেমা নিয়ে আলোচনা করার সুবিধে বিস্তর কারণ তাত্ত্বিকতার যাবতীয় ঢাল তরোয়াল হাতে নিয়ে, টেকনিক্যাল টার্মিনোলজির সুনিপুণ ব্যবহারে রায়, সেন এবং ঘটক এই তিন মায়েস্ত্রোকে চুলচেরা বিশ্লেষণে মেধাবী আলোচনায় অভ্যস্ত আমরা । ব্যক্তিগতভাবে সিনেমা সংক্রান্ত প্রচুর পত্রিকা পড়েছি এবং সেমিনারে থেকেছি এবং সবার মতো আমিও সেসবে মুগ্ধ হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু পাশাপাশি এও ভেবেছি যে -আমাদের চলচ্চিত্র ভাবনার পরিধি কি তবে ওই তিনজনেই আটকে থাকবে?এটা কি এক ধরনের সীমাবদ্ধতা নয়! আর যেসব জনপ্রিয় সিনেমাগুলোকে নিয়েও আলোচনা হয়েছে, ন্যায্য কারণেই সেসবে ভ্রু-কুঞ্চন এবং নাকসিঁটকানো মিশিয়ে আলোচনা হয়েছে! দ্বিতীয় জায়গাটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কারণ খুব সহজ। সেসব বস্তাপচা ফর্মুলা ছবিগুলোর প্রসঙ্গ এসেছে নেহাতই তুলনামূলক আলোচনায় । তাহলে ব্যাপারটা ঠিক কী দাঁড়াল! ওদিকে ঐ মেধাবী ত্রয়ী আর এদিকে ফর্মুলা ছবি, মাঝের জায়গাটা, মানে যে জন আছে মাঝখানে, সেটা মিসিং লিঙ্ক এর মতো আমাদের আড্ডা থেকে, চায়ের কাপ থেকে, পত্র-পত্রিকার, পাতা থেকে, সেমিনারের বিষয় থেকে সিম্পলি 'ভ্যানিস' । আমিও তো গা ভাসিয়েছি সেই প্রবাহেই,ফলে গল্প লেখার পাশাপাশি সামান্য সিনেমাপ্রেমী হিসেবে যখন সিনেমা সংক্রান্ত কোনো আলোচনা কিংবা লেখার জন্য আমন্ত্রণ পাই, আনন্দ হয় তো বটেই এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিষয় নির্বাচনের সিদ্ধান্তে বিলম্ব হয় না, আমার বা উদ্যোক্তা কোনো পক্ষেরই । এবং হ্যাঁ, সেইসব বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন ওই ত্রয়ীর কোনো একজন কিংবা তিনজনই, সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন । এই লেখার বিষয় ভাবনাতেও সেরকমটাই চলে আসছিল কিন্তু যিনি লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন সেই বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনিক কথোপকথন -কালে তিনি খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বললেন অন্যরকম সিনেমা নিয়ে ভাবুন-এই বিষয়ে তো আরও লেখা থাকছেই!আমার দীর্ঘদিনের অভ্যস্থ ভাবনা কিঞ্চিৎ ধাক্কা খেল বটে কিন্তু পরমুহুর্তেই মনে হলো ঠিকই বলছেন সেই বন্ধু!বরং যেজন বা যাঁরা আছেন মাঝখানে, মানে অন্যরকম এক নির্মাণে তাঁদের বা তাঁদের সিনেমা নিয়ে কথা হোক বরং ।

বহুদিন আগে প্রিয় এক সাংবাদিকের লেখায় পড়েছিলাম একটি মেয়ের কথা । কোনো এক সিনেমা সংক্রান্ত সেমিনারের পর জে এন ইউ-এর এক তরুণী কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভীষণ কনফিডেন্টলি বলেছিলেন-ভারতীয় সিনেমার দুটো টার্নিং পয়েন্ট, এক ধরনের সিনেমায় 'পথের পাঁচালী', অন্য ধরণের সিনেমায় নিঃসন্দেহে 'শোলে' । এটাই হচ্ছে মেরুকরণ! তো সেই উচ্ছল যুবতীর মন্তব্যটি

মানি বা না মানি, বিষয়টা আসলে এখানেই । হয় ঝিলকে ইসপার নয়তো উসপার । কিন্তু ইসপার আর উসপারের মাঝেও কিছু ছোট ছোট স্থলভূমি গড়ে ওঠে দ্বীপের মত খন্ড খন্ড কিছু জমি । অনেক সময় এপার-ওপারের মাঝে সেইসব স্থলভূমিগুলোই হয়ে ওঠে আমাদের ভালবাসার জায়গা, নিশ্চিন্ত এক আশ্রয় ।

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকের উত্তরসূরী হিসেবে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন বা আরও পরে ঋতুপর্ণরা যখন আলোচনায় চলে আসেন, তখনও কিন্তু কিছুটা ব্রাত্যই রয়ে যান তপন সিংহের মতো কিছু পরিচালক! হ্যাঁ, তপন সিংহ হচ্ছেন সেই পরিচালক যিনি এপার আর ওপারের মাঝের সেই সবুজ, স্নিগ্ধ এক ভূখন্ড যেখানে রয়ে যায় অদ্ভুত এক ভালোলাগা এবং সে ভালো লাগা কেবলই এন্টারটেনমেন্টজনিত ভালো লাগা নয়, সে ভালো লাগায় রয়ে যায় চিন্তার কিছু স্পেস, শিল্পের কিছু অনিবার্য শর্তপূরণ! সম্ভবত 'দ্য হিন্দু' পত্রিকা তাঁর 'দাদাসাহেব ফালকে' পাবার পর তপন সিংহের সিনেমা নিয়ে লিখেছিল – 'Complex ideas through a simple narrative.....!' হ্যাঁ, সত্যি তিনি পারতেন। তাঁর ছবির সুদীর্ঘ তালিকা থেকে মাত্র একটি ছবিকে আলোচনায় আনতে চাই, উদাহরণ হিসেবেই, 'গল্প হলেও সত্যি'! কোনো এক আলাপচারিতায় তপন সিংহ একবার বলেছিলেন – 'আমার হতাশ লাগে এই ভেবে যে দর্শক ছবিটাকে শুধুই হাসির ছবি হিসেবে নিল'! একজন পরিচালক হিসেবে তো হতাশ হবারই কথা এবং ন্যায্য কারণেই। যারা সিনেমাটি দেখেছেন, আরেকবার ভাবুন তো, 'গল্প হলেও সত্যি' কি নেহাতই হাসির ছবি? নির্ভেজাল হাসি আর এন্টারটেইনমেন্ট? রবি ঘোষের অসামান্য অভিনয়ে বুঁদ হয়ে থাকতে থাকতে বাঙালি দর্শকের কি একবারও মনে হয়নি, আপাত হাসির আড়ালে সিনেমাটির এক অন্তহীন স্পেস তৈরির কথা? প্রথম যখন 'গল্প হলেও সত্যি' দেখি, বয়েস নেহাতই কম। সেসময় নির্ভেজাল হাসি নিয়েই মুগ্ধ হয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন সিনেমাটা বেশ কয়েকবার দেখি, অনুভব করেছি একজন কুশলী পরিচালক কীভাবে তৈরি করেন ভাবনার স্পেস!ইংল্যান্ডের পাইনউড স্টুডিও থেকে সরাসরি কলকাতা, সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার থেকে পরিচালনায়, বাংলা সিনেমার দর্শক পেল এক পরিচালককে যিনি হেঁটে গেলেন মাঝের এক পথ বেয়ে। পাশাপাশি দু'টো পথেরই হাতছানি ছিল। বিস্তর আন্তর্জাতিক ছবি দেখার সুবাদে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ঘরানাগুলোর সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় পরিচয়, অন্যদিকে তথাকথিত আপাত জনপ্রিয়তার হাতছানিও ছিল। দুটো রাস্তাকেই সহজে এড়িয়ে মাঝামাঝির যে পথ তিনি বেছে নিলেন তাতে ঝুঁকি নেহাতই কিছু কম ছিলনা। 'গল্প হলেও সত্যি' দেখতে দেখতে তপন সিংহ সম্পর্কে সেই মন্তব্য বোধহয় ভীষণভাবে অনুভব করি – " A magical union of liberate art and critical populism made Tapan Sinha middle-of-the road – Bengali Cinema. যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে স্টোরিলাইন সেই ধনঞ্জয়ের আবির্ভাব থেকে সিনেমার শেষদৃশ্যে অদ্ভুত এক ধোঁয়াশার মধ্যে তার মিলিয়ে যাওয়া, পুরোটাই এক রহস্যময়তায় ঘেরা! কোথা থেকে এল ধনঞ্জয়, নানান প্রশ্নে তার হেঁয়ালি মাখানো উত্তর, একসময় চলেই বা গেল কোথায়, কোনো উত্তরই যনো প্রাত্যহিক বাস্তবতার সঙ্গে মেলেনা, কিন্তু ভীষণভাবেই প্রাত্যহিকতায় গড়ে ওঠে এ কাহিনীর নির্মাণ, চরিত্র, আঙ্গিক!

কিছুদিন আগে বুনুয়েলের একটি লেখা পড়ছিলাম, এ প্রসঙ্গে বলা জরুরি, যে চারজন চলচ্চিত্র পরিচালককে বার্গম্যান তাঁর চেয়ে এগিয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নামটিই বুনুয়েল। তো সেই লুই বুনুয়েল তাঁর লেখার একজায়গায় বলছেন – ''ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছবি, আত্মকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব এসব সেকেলে হয়ে গেছে। প্রদর্শিত সমস্যার সঙ্গে একাত্মবোধ না করলে দর্শক সেই ছবি নেবে না।

শিল্পের প্রথম কথা হল রহস্য। তা কবিতার চেয়েও জোরালোভাবে সিনেমায় আনা যায়! তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি' থেকে সরাসরি শটজাম্প করে বুনুয়েলে যাওয়াটা আপাতভাবে অপ্রাসঙ্গিক বা 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল' মার্কা মনে হলেও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনাও রয়ে যায় অবশ্যই। 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছবি', 'আত্মকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব' এসব প্রসঙ্গগুলো না এনেও বরং সেই রহস্যময়তার প্রসঙ্গে আসা যাক। 'শিল্পের প্রথম কথা হল রহস্য' – এই আপ্তবাক্যটিকে মেনে নিয়ে একটি কথা বলা জরুরি, 'রহস্য' মানে আক্ষরিক অর্থের বাইরে ভিন্নতর এক স্পেস তৈরি, যেখানে ছুঁয়ে থাকে যাদুবাস্তবতা। 'গল্প হলেও সত্যি' সম্পর্কে বলা যায় 'unique in its structure, feel of magic realism'! তথাকথিত 'আর্ট ফিল্ম' বা 'প্যারালাল সিনেমা' জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহার না করেও বলা যায় তপন সিংহের এ ছবি কমার্সিয়াল সিনেমার অনেকটা দূরের সমান্তরাল এক পথ দিয়ে হেঁটেও ভীষণভাবে 'সার্বজনীন এবং সর্বত্রগামী'! অপরিণত মস্তিষ্কে প্রথমবার এ সিনেমা দেখার বহু বহু বছর পর যখন আবার আবার দেখলাম, নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম কীভাবে চিত্রনাট্য, ডায়ালগ, অভিনয়ের নিখুঁত মেলবন্ধন একটা সিনেমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়! ১৯৬৬ তে নির্মিত ছবিটির প্রেক্ষাপট এক একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবার। প্রাত্যহিক টানাপোড়েন, একান্নবর্তী পরিবারের অনিবার্য মনকষাকষির এক সংসারে ধনঞ্জয়ের আচমকা আবির্ভাব এবং সেই প্রাত্যহিকতার, টানাপোড়েনের ক্যাকোফনি থেকে কল্পরাজ্যের সিম্ফনিতে যে উত্তরণ, তা তো আসলে সেই সুররিয়ালিস্টিক স্ট্রাকচার! এ সিনেমায় গানের ব্যবহার শুধু কমই নয়, অতি কম কিন্তু 'এ জীবন গেলে ফিরে আসেনা আবার' তো সিনেমার মূল সুরটিই দিয়েছে বেঁধে। 'গল্প হলেও সত্যি' দেখতে দেখতে বার বার একটা কথা মনে হয়, শেষ দৃশ্যটা কি খুব দ্রুত, অনাড়ম্বর হলো? একটা গল্পের নির্মাণ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, ঠিক সেসময় এতো কম কথায় এভাবে শেষ হয়ে যাওয়াটা কি সরলীকরণ নয়! কতটাই বা শিল্পসম্মত! চিন্তার নানান স্রোত, প্রতিস্রোতে শেষপর্যন্ত কিন্তু মনে হয় এটাই সেরা, এর থেকে নিখুঁত, শিল্পসম্মত, অব্যক্ত কিছু হতে পারত না! পরিমিতিবোধ এবং রহস্যময়তা, একজন কুশলী পরিচালক হিসেবে তপন সিংহ এই দুইয়ের সচেতন ব্যবহারই করেছেন!

আসলে বাংলা সিনেমায় তপন সিংহের আবির্ভাব সম্পর্কে বলা যেতে পারে – "Bengali Cinema had got its first artiste, and art cinema its first unrepentant entertainer. তাঁর আত্মজীবনী 'মনে পড়ে' পড়েছিলাম বহুদিন আগে! জেনেছিলাম দেশি বিদেশি বিভিন্ন বিখ্যাত সিনেব্যক্তিত্ব, পরিচালকদের সঙ্গে তাঁর নানান অভিজ্ঞতার কথা! সত্যজিৎ রায়, মৃনাল সেন দুজনেই কিন্তু ভাবনার পার্থক্য সত্ত্বেও তপন সিংহকে একজন শ্রেষ্ঠ 'middle-of-the-road' পরিচালক হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন! সত্যজিৎ রায় তপন সিংহের সিনেমাভাবনাকে যে যথেষ্ঠই গুরুত্ব দিতেন তার একটা ছোট্ট গল্প বলেই বরং এ লেখার ইতি টানা যাক। 'চারুলতা' রিলিজ করার পর তপন সিংহ সত্যজিৎ রায়কে ফোন করে বললেন – চারুলতা একেবারে ওভার বাউন্ডারি কিন্তু 'মহানগর-এ যে ছ'বলে ছ'টা বাউন্ডারি হয়েছে সেটা কিন্তু কেউ মনে রাখবে না। শুনে হো হো করে হেসেছিলেন সত্যজিৎ। বেশ কিছু বছর পর দু'জনেই রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান থেকে একই বিমানে পাশাপাশি বসে ফিরছিলেন। সত্যজিৎ রায় হঠাৎ তাঁকে বললেন "জানেন, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, সবাই 'চারুলতা'র কথা বলে, 'মহানগর' বোধহয় হারিয়েই গেল।"

এ প্রসঙ্গের অবতারণা আসলে তাঁর গভীর চলচ্চিত্রবোধ এবং ভাবনা সম্পর্কে বলার জন্যই। দর্শকের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন তিনি কিন্তু সেটা কখনোই শুধুমাত্র একজন এন্টারটেইনার হিসেবে নয়, এক্ষেত্রে চার্লি চ্যাপলিনের

নামটা স্বত:স্ফূর্তভাবেই মনে এলো! শিল্পের যে কোনো মাধ্যমেই অনেকগুলো স্রোত বহমান। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। সেইসব মূল, সমান্তরাল ইত্যাদি নানারকম স্রোতের মাঝে তপন সিংহ বা চ্যাপলিনরা গুরুত্বপূর্ণ একটা স্রোত। বাঙালি তিন মায়েস্ত্রোর উত্তরসূরি হিসেবে যাঁদের নামগুলো উচ্চারিত হয়, সিনেমামেধা এবং দক্ষতায় তপন সিংহ তাঁদের থেকে কম তো ননই, বরং এগিয়েই। তো বক্স অফিস সফলতার জনমনোরঞ্জকারী সিনেমার হাতছানি এবং সেইসব সমান্তরাল ছবির প্রবল হাতছানি এড়িয়ে এন্টারটেইনমেন্ট এবং আর্ট-ফর্মকে মিশিয়ে অদ্ভুত এক ভারসাম্য রক্ষা করে সিনেমা বানানো নেহাতই ঝুঁকি নেওয়াই নয়, স্যাক্রিফাইসও বটে! দুদিকের প্রায় নিশ্চিত সাফল্যকে এড়িয়ে একের পর এক নির্মাণে মেতে ছিলেন তিনি। বেছে নিয়েছিলেন এক নিজস্ব ঘরানা। ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় পরিচালকের নাম আঁন্দ্রেই তারকোভস্কি।একদম ভিন্ন ঘরানার এক পরিচালক, যাঁর সঙ্গে তপন সিংহের ঘরানার মেরুদূরত্ব কিন্তু এ লেখার ক্ষেত্রে তারকোভস্কির একটা কথা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, অন্তত 'গল্প হলেও সত্যি' প্রসঙ্গে – "The artist exists because the world is not perfect. Art would be useless if the world were perfect, as man wouldn't look for harmony but would simply live in it. Art is born out of an ill-designed world". ঘরানার মেরুদূরত্ব হলেও কথাগুলো তপন সিংহ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সেই ক্যাকোফনি থেকে সিম্ফনির যাত্রায় তিনি শেষপর্যন্ত এক অসামান্য শিল্পী।

তিনি তর্কাতীতভাবে সমান্তরাল সিনেমার কক্ষপথের বাইরে সবচেয়ে আপসহীন চলচ্চিত্র নির্মাতা। এবং তার বিস্ময়কর কাজটি সম্ভবত একজন মৃণাল সেন বা একজন সত্যজিৎ রায়ের দ্বারাই মিলতে পারে। তিনি হলেন চলচ্চিত্রের মহাপুরুষ-তপন সিনহা।

চার্লস ডিকেনের উপন্যাস এ টেল অফ টু সিটিজ এবং রোনাল্ড কোলম্যানের এই উপন্যাসের সিনেমাটিক সংস্করণ তপন সিনহাকে চলচ্চিত্রে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। সিনহা একজন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট হিসেবে শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে ডিরেকশনে চলে যান।

তপন সিনহা 1950-এর দশকে বিদেশে গিয়েছিলেন, আরও স্পষ্টভাবে লন্ডনে। তার সফরের উদ্দেশ্য ছিল ফিল্ম মেকিং শেখা এবং ভালো ফিল্ম বানানোর ক্যারিয়ার শুরু করা। লন্ডনে পৌঁছে তিনি পাইনউড স্টুডিওর ম্যানেজার মিঃ ক্রাইহার্সথের সাথে যোগাযোগ করেন। তার সাহায্যের মাধ্যমে, তিনি তার প্রথম অ্যাসাইনমেন্টটি ব্যাগ করতে পেরেছিলেন। তিনি পরিচালক চার্লস ক্রিটনের ইউনিটে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করতে পেরেছিলেন। চার্লস ক্রিটন, যিনি ল্যাভেন্ডার হিল মব এবং অন্যান্যদের মতো কিছু ভাল ব্রিটিশ কমেডি তৈরি করেছিলেন তখন দ্য হান্টেড নামে একটি চলচ্চিত্রের জন্য কাজ করছিলেন।

তার যৌবনে, তপন সিনহা সমসাময়িক আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সিনেমা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তার প্রিয় পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন জন ফোর্ড, ক্যারল রিড, বিলি ওয়াইল্ডার এবং আরও অনেকে। তারা তাকে চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি মনে করতেন যে এই লাইনে তাকে চলচ্চিত্র

নির্মাণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজ তাঁর কাছে অনুপ্রেরণার একটি বড় উৎস ছিল। তিনি ঠাকুরকে দূরে রাখতে পারেননি। প্রতিটি ঠাকুরের কাজ তার জীবনের বিভিন্ন মুহুর্তে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কোনো ব্যক্তি তাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রভাবিত করেনি। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তার দৃঢ় ও গভীর বিশ্বাস অনুপ্রেরণার একটি নিরন্তর উৎস।

তপন সিনহার প্রথম ছবি অঙ্কুশ (1954) একটি নারায়ণ গাঙ্গুলীর গল্প SAINIK-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রে একটি হাতি ছিল।

তার পরবর্তী উপহারে উত্তম কুমার, মঞ্জু দে এবং অন্যান্যরা অভিনয় করেন। এরপর, তিনি একটি কমেডি চলচ্চিত্র টনসিল তৈরি করেন, যেখানে মাধবী মুখার্জি তার আত্মপ্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প অবলম্বনে তপন সিনহার কাবুলিওয়ালা। ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য, কালী ব্যানার্জী এবং মঞ্জু দে অভিনয় করেছেন। ছবিতে ছোট মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন টিংকু ঠাকুর। জেলর হিসেবে জীবন বোসের একটি ভালো ভূমিকা ছিল, যিনি কাবুলিওয়ালাকে পছন্দ করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত খোরো বয় বয় বেগে চারি দিক চাই মেঘে ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিটি তপন সিনহার ব্যক্তিত্বকে চিত্রিত করেছে – হৃদয়ের একজন শিশু। গালপো হোলো সত্তি, হারমোনিয়াম এবং নিরাপদ হাতির মতো চলচ্চিত্রেও একই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।
তপন সিনহার কাবুলিওয়াল্লা পরবর্তীতে হিন্দিতে তৈরি করেন বিমল রায় এবং পরিচালনা করেন হেমান গুপ্তা, যেখানে বলরাজ সাহানি ছিলেন। Oerdellin কাবুলিওয়াল্লা-তে শিশু প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কাবুলিওয়াল্লাহ (1957) বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মিউজিক অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন। ছবিতে কাবুলিওয়াল্লাহ (বলরাজ সাহানি) শিশুদের দ্বারা ভয় পান এবং পরে তিনি প্রকৃতপক্ষে শিশুদের প্রেমিক হয়ে ওঠেন। বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কাবুলিওয়াল্লাহ সিলভার বিয়ার জিতেছেন।

তপন সিনহার লুহো কোপাট (1958) বাঙালি লেখক জোড়াসন্ধোর গল্প অবলম্বনে নির্মিত। জোরাসন্ধো যিনি বেশিরভাগই জেল জীবন নিয়ে লিখতেন অর্থাৎ অপরাধের চারপাশে আবর্তিত মানুষের জীবন নিয়ে লিখতেন, লৌহো কোপাতে তাঁর অন্যতম সেরা উপন্যাস লিখেছেন। কমল মিত্র, সুপরিচিত বাঙালি অভিনেতা লৌহো কোপাতে তার অন্যতম সেরা অভিনয় দিয়েছিলেন। জেলর হিসেবে নির্মল কুমারও প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। অনিল চ্যাটার্জি চরিত্রে ভালো অভিনয় করেছেন।

কালামাটি (1958) প্রথম চলচ্চিত্র যা কয়লাখনি এলাকায় ক্রেচের জীবন নিয়ে কাজ করে। এটি তার সময়ের অনেক আগে নির্মিত একটি চলচ্চিত্র ছিল। অনিল চ্যাটার্জি ছবিতে একটি স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সিনহার খনিকের আতিথে (৫৯) সত্যিই একজন ডাক্তার এবং প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে একটি চলমান চলচ্চিত্র। এতে ছিলেন নির্মল কুমার, রুমা গুহ ঠাকুরথা, অনিল চ্যাটার্জি, তুলসী লাহিড়ী, রাধামোহন ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যরা।
ছবিটি ছিল ঠাকুরের একটি গল্প অবলম্বনে। এটি সুনীল দত্ত এবং ওয়াহিদা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (72) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] (60) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

আরাম তাকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। তার মন সবসময় উড়ে বেড়াত, ফুলের সাথে এবং বুনো গাছের সাথে দোলাতে থাকে। অজানাকে জানার কৌতুহল ছিল তার। সিনহার ATITHE-তে পার্থ মুখার্জি, স্মিতা সিনহা এবং অজিতেশ ব্যানার্জি ছিলেন।

মধ্য পর্যায়:

GOLPO HOLEO SATTI (66) একটি সুন্দর ব্যঙ্গাত্মক চলচ্চিত্র ছিল যে কীভাবে একজন স্বর্গ-প্রেরিত সেবক (রবি ঘোষ অভিনয় করেছেন) একটি ঝগড়া- বিবাদমান অসংগঠিত পরিবারে শৃঙ্খলা ও শান্তি নিয়ে আসে। ভানু ব্যানার্জী এবং কিছু ছোট-সময়ের অভিনেতা (ভারতী এবং ছায়া দেবী ব্যতীত) কাস্টে ছিলেন। এটিকে হিন্দিতে রিমেক করেছিলেন হৃষিকেশ মুখার্জি বাওয়ার্চি চরিত্রে, যেখানে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন রাজেশ খান্না।

হাতে বাজার (67) বানফুলের একটি আত্মজীবনীমূলক গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। কেন্দ্রীয় অভিনয়শিল্পী ছিলেন অশোক কুমার এবং বৈজন্তীমালা বালি।

আধার পেরিয়ে (৭৩) মাধবী মুখার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, সুমিত্রা মুখার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, নির্মল কুমার, সুব্রত চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জি, চিন্ময় রায় এবং অন্যান্যরা অভিনয় করেছেন। এটি ছিল সিনহার একটি মধ্যম কাজ, এবং এটি ছিল চিত্তরঞ্জন মাইতির একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে।

হারমোনিয়াম (76) দুর্গাদাস ব্যানার্জী, অনিল চ্যাটার্জি, সত্য ব্যানার্জি, আরতি ভট্টাচার্য, স্বরূপ দত্ত, কালী ব্যানার্জি এবং সমিত ভাঞ্জা, ছায়া দেবী এবং অন্যান্যদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

এক যে চিলো দেশ (৭৭) একটি চমৎকার ফ্যান্টাসি ফিল্ম। এটি শঙ্করের একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল। এটি একজন পাগল বিজ্ঞানী সম্পর্কে ছিল যিনি এমন একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন যা একজন ব্যক্তির অতীতের অসৎ জীবনকে প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে যাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল সেই দুষ্ট ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদরা বিজ্ঞানীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। বলা বাহুল্য, তারা তাদের ডিজাইনে সফল হয় না। দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখার্জি, কালী ব্যানার্জি, অনিল চ্যাটার্জি এবং অন্যান্যরা অভিনয় করেছেন।

আদমি অর আওরাত (82) প্রফুল্ল রায়ের একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। অমল পালেকার এবং মহুয়া রায়চৌধুরী অনবদ্য অভিনয় করেছেন। সিনহার AADMI AUR AURAT বাংলায় মনুষ (সমিত ভাঞ্জা, দেবিকা মুখার্জি) হিসাবে পুনঃনির্মাণ করেছিলেন পরিচালক নিজেই।

APANJAN (68) ছিল তরুণ বেকার যুবকদের একটি গল্প যেখানে স্বরূপ দত্ত এবং সমিত ভাঞ্জ স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। এখানে তিনি বেকারদের মধ্যে যুব অস্থিরতার দিকে নজর দিয়েছেন। আপনজানকে গুলজার হিন্দিতে মেরে আপনে হিসেবে রিমেক করেছিলেন। ছবিটিতে ছায়া দেবী, রবি ঘোষ, ভানু ব্যানার্জী,

কল্যাণ চ্যাটার্জি, পার্থ মুখার্জি, নির্মল কুমার এবং অন্যান্যরা অভিনয় করেছিলেন।

সাগিনা মাহাতো (70) একটি ভাল প্রচেষ্টা ছিল। চলচ্চিত্রটি সাগিনাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, একজন কুলি যিনি নিপীড়িতদের প্রতি অবিচার হতে দেখতে পাননি এবং পরে তাদের নেতা হয়ে ওঠেন। কেউ কেউ সাগিনা মাহাতোকে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন, যদিও মানব নাটক এবং সম্পর্ক এই মহান রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিহিত। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলীপ কুমার ও সায়রা বানু। পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চ্যাটার্জি। এই ছবির বাংলা সংস্করণে অভিনয় করেছেন উত্তম কুমার।

তপন সিনহা বেশ কিছু ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। স্মরণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত কেনো চোকের জলে বিজয়ে দেলম না, সুখনো দুলো জোতো তাঁর একনি (৭১) চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। ছবিতে স্বরূপ দত্ত, অপর্ণা সেন, মৌসুমী চ্যাটার্জি, নির্মল কুমার, চিন্ময় রায়, পাদ্দা দেবী, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, এন. বিশ্বনাথন এবং অন্যান্যরা অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি রমাপদ চৌধুরীর একটি উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত।

RAJA (75) দেবরাজ রায়, সমিত ভাঞ্জা, আরতি ভট্টাচার্য, মহুয়া রায় চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জি, সন্তু মুখার্জি এবং অন্যান্যরা অভিনয় করেছেন। একজন বেকার যুবকের গল্প যে তার চারপাশে অনেক মন্দ, অবিচার এবং দারিদ্র দেখে। যুবক একটি রহস্যময় মহিলার (আরতি ভট্টাচার্যজি) সাথে বন্ধুত্ব করে যে তাকে তার নিজের নোংরা ব্যবসার জন্য ব্যবহার করে। তার একটি করুণ অতীত রয়েছে যা তাকে এই লাইনটি বেছে নিতে বাধ্য করেছে এবং সে এখন এমন একটি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে যা নিষ্পাপ মেয়েদের ধ্বংস করে। এরকমই একজন মেয়ে মহুয়া রায়চৌধুরী, যে আরতির ফাঁদে পড়েছিল, কিন্তু রাজা (দেবরাজ রায়) তাকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। অনিল চ্যাটার্জি একজন বিদেশী বংশোদ্ভূত ইন্দোফিল বাবা হিসেবে দেবরাজকে মহুয়ার চাকরি পেতে সাহায্য করেন। রাজা শেষ পর্যন্ত মারা যায়, কিন্তু মহুয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর পরেই।

বাঞ্ছারামের বাগান (80) একজন বয়স্ক মালী হিসাবে মনোজ মিত্রের দ্বারা দেওয়া সেরা পারফরম্যান্সগুলির মধ্যে একটি দেখেছেন। বাঞ্ছারামের বাগান মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান নামে একটি নাটকের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। বাঞ্ছারাম একটি জমির মালিক ছিলেন যেখানে তিনি তার সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলেন। এলাকার দুষ্ট জমিদার, একজন লোভী লোক (ছবিতে তার নিজের ছেলের ভর্তির কারণে) এই বাগানের দিকে নজর রাখে এবং এটি দখল করতে চায়। কিন্তু বাঞ্ছারাম যে এটা বিক্রি করার জন্য অনড়, বাড়িওয়ালা তাকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য গুন্ডা নিয়োগ করে। প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাওয়ার সময় বাঞ্ছারাম এক জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সৌভাগ্যবশত তার জন্য, ম্যাজিস্ট্রেট (একজন বিদেশী), যিনি শিকার করছিলেন, তাকে ধরে ফেলে এবং তার দুর্দশার কথা শুনে তার প্রতি করুণা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বাড়িওয়ালাকে সতর্ক করে দেন যে তিনি যদি কখনও বাঞ্ছারামের বাগানে পা রাখেন, তাহলে বাড়িওয়ালাকে এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। বাড়িওয়ালা খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন, কারণ তিনি খুব ছোট মালীর কারণে সতর্কতা পেয়েছিলেন। সেই রাতে সে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে (যখনই সে রেগে যায়, এটা তার স্বাভাবিক আচরণ) এবং আত্মহত্যা করে। বিশ বছর পর একজন নতুন জমিদার অসুস্থ

[illegible]

[illegible]

ATANKA (86) [illegible]

[illegible]

[illegible] EK DOCTOR KI MAUT-[illegible]

[illegible]

[illegible]

অন্যদের উপহাস হয়ে ওঠে। "আমি এই গল্পটি দিল্লিতে একজন তরুণ বিজ্ঞানীর আত্মহত্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছি" পরিচালক বলেছেন। বিজয়ন্দ্র ঘাটগে, বসন্ত চৌধুরী এবং দীপা সাহি এই ছবিতে স্মরণীয় ক্যামিও ছিলেন।

তপন সিনহার হুইল চেয়ারে (94) সৌমিত্র চ্যাটার্জি, লাবনী সরকার এবং অর্জুন চক্রবর্তীর একটি শক্তিশালী কাস্ট ছিল। লাবনী সরকার একজন প্রতিবন্ধী (যিনি ধর্ষিত হয়েছিল) এবং একটি হুইলচেয়ারে সীমাবদ্ধ হিসাবে একটি দুর্দান্ত অভিনয় দিয়েছেন। চলচ্চিত্রটি পরিচালক নিজেই একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যদিও এটি একজন ক্রুসেডিং ডাক্তারের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ফিল্মটি এমন এক যুবতীকে নিয়ে ছিল যে এক সন্ধ্যায় অফিসে শ্লীলতাহানির শিকার হয়। তিনজনের সাথে লড়াই করার সময়, সে আহত হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় পড়ে থাকে। কিন্তু এই ছবিতে, তিনি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান যে যথাযথ চিকিৎসা সেবা এবং মানসিক ভরণপোষণও পেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আরও ভালো জীবনের জন্য উন্মুখ হতে পারেন।

শিশুদের চলচ্চিত্র

নিরাপদ হাতি (78) শত্রুঘ্ন সিনহা এবং মালা জাগ্গিকে অভিনয় করেছেন। ইরাভাত একটি সাদা হাতি তার মামা (সাধু মেহের) এবং খালা (মালা জাগ্গি) এর বিরক্তির জন্য একটি ছোট ছেলের মধ্যে একজন প্রশংসক খুঁজে পায়। একজন শিকারী (শত্রুঘ্ন সিনহা)ও সাদা হাতির প্রতি আগ্রহী যদিও তার উদ্দেশ্য কঠোরভাবে ব্যবসা। এছাড়াও গায়ত্রী অভিনীত। গল্পটি লিখেছেন তপন সিনহা নিজেই। কল্যাণ চ্যাটার্জি একজন পোস্টম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি হিন্দিতে তৈরি হয়েছিল।

সবুজ দীপের রাজায় সমিত ভঞ্জা

সবুজ গভীর রাজা (79) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গুলি করা হয়েছিল এবং এটি সুনীল গাঙ্গুলীর একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল।

আজ কা রবিনহুড (৮৭) একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র যা তাসখন্দ, বার্লিন, সোফিয়া এবং অন্যান্য 12 টি আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। চলচ্চিত্রটির চলমান সময় 80 মিনিট। রাম যাদব সিং, একজন সামন্ত জমিদার, তিনি যে টাকা ধার দেন তার সুদ থেকে জীবনযাপন করেন। যতীন বাবুর রবিনহুডের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, তরুণ টেট্রা ধনীদের কাছ থেকে নথি চুরি করে দরিদ্রদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি করার পরে, তিনি সামন্ত প্রভুর ক্রোধের মুখোমুখি হন। এটি সরল মনে হতে পারে, কিন্তু সিনহার চলচ্চিত্রে সামাজিক কুফল নিয়ে উদ্বেগ একটি প্রাণবন্ত উপায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

সিনহার শেষ উদ্যোগ, ANOKHA MOTI, অর্জুন চক্রবর্তীর চরিত্রে, হিন্দিতে একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্রও ছিল।

পরবর্তী কাজ

তপন সিনহা একটি টেলিফিল্ম ডিআইডিআই (৮৪) তৈরি করেন যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন দীপ্তি নাভাল।

বয়দুরজের রহস্য (৮৫) ছিল একটি গোয়েন্দা চলচ্চিত্র যার মধ্যে মনোজ মিত্র, বিষ্ণু গুহ ঠাকুরথা, তাপস পাল, আল্পনা গোস্বামী, মুনমন সেন এবং প্রেমাংসু বোস ছিলেন বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে।

অন্তরধন (৯২) সৌমিত্র চ্যাটার্জি, মাধবী চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, সব্যসাচী চক্রবর্তী, শতাব্দী রায়, রিকু দত্ত, ভীষ্ম গুহ ঠাকুরথা, রমেন রায় চৌধুরী, হারাধন ব্যানার্জি এবং অর্জুন চক্রবর্তীর একটি শক্তিশালী কাস্ট ছিল। এটি পতিতাবৃত্তির র্যাকেটের বড় ব্যবসার সাথে মোকাবিলা করেছে যা আমাদের শহরে বিকাশ লাভ করছে এবং একটি মেয়ে তার প্রেমিকের সাথে নিখোঁজ হয়েছে। এটি দিব্যেন্দু পালিতের একটি গল্প অবলম্বনে নির্মিত। সৌমিত্র একজন অধ্যাপকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যার মেয়ে (সতাব্দী) এখনও নাবালিকা (18 বছরের কম) নিখোঁজ। অর্জুন চক্রবর্তী, একজন সুদর্শন ছেলে যে তাকে বিয়ে করে এবং তাকে বিশ্বের প্রাচীনতম পেশায় ব্যবহার করে তাকে প্রেম ও বিয়ের প্রলোভন দিয়েছে। একটি কলঙ্কিত কন্যাকে গ্রহণ করার জন্য পিতার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাকে একটি সুন্দর জীবন প্রদানের জন্য তার কর্তব্য ঘটনাগুলির উন্মোচনের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে। তপন একটি বাস্তব জীবনের ঘটনা বা এমনকি একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের কাল্পনিকতা অনুভব করেন, যেখান থেকে মূল গল্পের উৎস উদ্ভূত হওয়ার কথা, সিনেমা নাটকীয়তার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। রোমান্টিক জুটির ট্র্যাক ডাউন করার জন্য কিছু আকর্ষণীয় কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র জড়িত, যাদের মধ্যে একজন সৎ পুলিশ অফিসার রয়েছেন, যার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী৷

তিনি একটি ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে শাবানা আজমি, জয়া ভাদুড়ি, দীপা সাহি, সুলভা দেশপান্ডেকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে নিয়ে শতাব্দীর কন্যা (99) নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। শরৎ চন্দ্র চ্যাটার্জি, তারাশঙ্কর ব্যানার্জি, গৌর কিশোর ঘোষ, দিব্যেন্দু পালিতের মতো অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বাঙালি লেখকদের গল্পও ছবিতে স্থান পেয়েছে। ছবিটিতে ছয়জন অভিনেত্রী রয়েছেন, প্রত্যেকেই ছয়জন বিখ্যাত লেখকের গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পরিচালক এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে প্রচুর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও, মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। সিনহা এই ছবির জন্য যে পর্বটি শ্যুট করেছিলেন তার একটি হল চারু, গৌর কিশোর ঘোষের ছোট গল্প EI DAHO এর উপর ভিত্তি করে।

আজব গায়ের আজব কথা (৯৯) প্রখ্যাত বাঙালি লেখক শিরসেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি। এই ছবিটি, সিনহার নিজের ভাষায় "শিশু সহ সকলের জন্য ডিজাইন করা একটি আধা-ফ্যান্টাসি।" AGAK "একটি অদ্ভুত গ্রামের একটি অদ্ভুত গল্প।" বার্তাটি হল, আজকের সমাজে যেকোনো কিছু করার জন্য কমিউনিটি ড্রাইভ থাকা প্রয়োজন। পরিচালক বলেন, “আমাদের সব কিছুর জন্য সরকারের দিকে তাকাতে হবে না। “পশ্চিমে এবং সুদূর পূর্বেও, সম্প্রদায়ের উদ্যোগের ব্যবস্থা রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদেরও একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত।” তিনি যোগ করেছেন, "এই গল্প অনুসারে, একজন ব্যক্তিকে যে কোনও প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।" আজাব গায়রের কাস্ট………. প্রধান চরিত্রে রয়েছেন দেবশ্রী রায়।

তিনি একজন হালকা হৃদয়ের "গ্রামের মেয়ে" চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দেবশ্রী এর আগে এমন চরিত্রে অভিনয় করেননি এবং আমি তাকে এটির জন্য একেবারে উপযুক্ত বলে মনে করেছি,” বলেছেন পরিচালক। ছবিতে এটিই একমাত্র মহিলা চরিত্র যার বড় পর্দায় একটি নতুন মুখ রয়েছে, দেবেশ রায় চৌধুরী। ফিল্মে তার ভূমিকার জন্য তাকে অনেক "দৈহিক শ্রম, যার মধ্যে স্প্রিন্টিং" করতে হবে। বাকি কাস্টে রয়েছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি, মনোজ মিত্র, নির্মল কুমার এবং বিভাস চক্রবর্তী। ছবির শুটিং হয়েছে গঙ্গার তীরে ফলতায়।

রাজা সেন তপন সিনহার উপর একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেছেন যার নাম ফিলমেকার ফর ফ্রিডম তার প্রতিভাকে তুলে ধরে।

তপন সিনহা একটি টিভি সিরিয়াল (গোয়েন্দা ঘরানার) তৈরি করেছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি, মনোজ মিত্র, ধীমান চক্রবর্তী, রবি ঘোষ এবং অন্যান্যদের অভিনয়ে।

তপন সিনহার স্ত্রী, চলচ্চিত্র নির্মাতা অরুন্ধুতি দেবী 1990 সালে মারা যান।

তপন সিনহা কয়েকটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং এর মধ্যে একটি ছিল বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবনীমূলক চলচ্চিত্র।

একটি মূল্যায়ন

যদিও তপন সিনহা চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বিনোদনের মাস্টারপিস তৈরি করে চলেছেন, সাহিত্যের স্বাদ এবং মানবিক উষ্ণতার সাথে মিশ্রিত প্রত্নতাত্ত্বিক বাংলা নাটকটি তার উচ্চতর। মানব জীবনের রহস্যের মধ্যে কাজ করার সময় তাঁর চলচ্চিত্রগুলি সবচেয়ে জীবন্ত দেখায়, "ক্ষনিকার আতিথে"-এ তার অতীত রোম্যান্সের ছায়ায় থাকা এক তরুণী বিধবার ছবি, বা লুহোকোপটের একজন বন্দী বা সামাজিক ড্রপআউট, আপনজানের একজন রফিন।

গত আট বছরে তপন যে চলচ্চিত্রগুলি তৈরি করেছেন তার একেবারে সাম্প্রতিক সিরিজগুলিতে, দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি বা প্রতিকূল এবং চক্রান্তকারী ব্যক্তিদের দ্বারা আতঙ্কিত একজন বিশ্বস্ত এবং আদর্শবাদী মানুষ, অদম্য ব্যক্তিত্ববাদের উদাহরণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। “আমি সবসময় ব্যক্তিগত সাহস ও প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী। আমি মনে করি, সমষ্টিগত ব্যবস্থা বা জীবন খুব কমই একজন ব্যক্তিকে তার মধ্যে অসীম শক্তি আবিষ্কার করতে দেয়। আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করি যার যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সাহস আছে, তাই আমি একজন ব্যক্তিকে AADMI AUR AURAT, ATANKA এবং EK DOCTOR KI MAUT-এ সমস্ত বিপদের বিরুদ্ধে নিরলস যোদ্ধা হিসাবে দেখিয়েছি। এই চলচ্চিত্রগুলিতে আমার নায়করা তাদের নিজস্ব শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের দ্বারা কার্যত অলৌকিক কাজ করেছে। অন্তর্ধনেও, প্রফেসর তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে খুঁজে বের করার কাজ নেন। তিনি কেবল নিজের উপর নির্ভর করেন এবং অন্য কারও উপর নির্ভর করেন না, পরিচালক বলেছেন। এই কুকুরছানাদের সাথে সিনহা সেলুলয়েডে নতুন ধরনের সৃজনশীলতার ছাপ দিতে সফল হয়েছেন।

তপন সিনহার ফিল্মগ্রাফি বিষয়ের একটি আশ্চর্যজনক বৈচিত্র্য উপস্থাপন করে। এমনকি পরিচালক যখন দর্শকদের প্রচুর বিনোদন দিয়েছেন, তিনি প্রতিবারই নতুন সুতো দিয়ে চলচ্চিত্র দর্শকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা করেছেন। এবং এগুলি সাধারণ ভিড়-আনন্দজনক ছিল না বা পরিচিত সূত্রগুলিতে আটকে আছে বলে মনে হয় নি। বক্স-অফিসের একজন সত্যিকারের কমান্ডার, তপন সিনহা পরপর পাঁচটি সুপার হিট চলচ্চিত্রের প্রস্তাব দিয়েছেন - যথা ক্ষুদিতা পাসন, কাবুলিওয়াল্লা, হাতে বাজার, আপনজান এবং একহানি - এমন একটি রেকর্ড তৈরি করেছে যা আজও অপ্রতিরোধ্য। তবুও এই প্রতিটি চলচ্চিত্রে, ব্যাপকভাবে পঠিত সাহিত্যকর্ম থেকে বিশ্বস্তভাবে অভিযোজিত এবং সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, একজন গুরুতর পর্যবেক্ষক সৃজনশীল বিস্ফোরণ আবিষ্কার করতে পারেন যা একটি জনপ্রিয় কাজকে শৈল্পিক স্তরে উন্নীত করে। সরাসরি পর্দায় আনন্দদায়ক চমক ঘোরানোর এই অপ্রয়োজনীয় দক্ষতা তার সমস্ত চলচ্চিত্রে দেখা যায়, এমনকি তার কাজও যেমন আপনজান, রাজা বা অতঙ্কার মতো জীবনের কাঁচা বাস্তবতা রয়েছে।

3. জন্মশতবর্ষে তপন সিংহের সংগীত: এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

জানুয়ারি মাস, শীতের সকাল। সালটা ঠিক মনে করতে পারছি না। দ্রুতগতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে হলদিয়ার দিকে। গাড়ির মধ্যে আমরা চারজন আরোহী। তপনদা (Tapan Sinha), অরুন্ধতী দেবীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী এবং তপনদার একাধিক ছবির কস্টিউম ডিজাইনার সংগীতশিল্পী মুকুল মুখার্জি এবং তপনদার ছবির প্রধান স্থির চিত্রগ্রাহক সুকুমার রায়। হলদিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ‘হলদিয়া উৎসব’-এ তপনদা এবং ভারতরত্ন সানাইবাদক ওস্তাদ বিসমিল্লা খানের সংবর্ধনাসভায় উপস্থিত থাকা। যথাসময়ে সেখানে পৌঁছানো গেল। সরকারি অতিথিশালায় বিশ্রাম, তপনদার সঙ্গে এক টেবিলে মধ্যাহ্নভোজ— সবই সারা হল সময়মতো। অনুষ্ঠান শেষে আবার কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল।

চিরকালই বাসে বা গাড়িতে বেশি দূরত্বের পথ পাড়ি দিতে আমার অসুবিধা হত এবং এখনও হয়। যাত্রাপথে আমার অসুবিধার কথা জানতে পেরে তপনদা গাড়ি থামিয়ে নিজে পিছনে এসে বসলেন আর আমাকে নিজের জায়গায় বসতে বললেন। এ হেন প্রস্তাবে আমার আপত্তি ওঁর কথার ওপর টিঁকল না। গাড়ি চলতে থাকে আর দু’পাশে সরে যায় চলমান প্রাকৃতিক দৃশ্য। সন্ধ্যাকাশের একটি বিশেষ দৃশ্যের দিকে আমাদের চোখ পড়ে। নীল আকাশের গায়ে অনেক সাদা টুকরো মেঘ জমে আছে। মনে হয় যেন কোনও চিত্রকরের তুলিতে আঁকা ছবি। আমার দৃষ্টি গিয়ে আটকায় তপনদার মুখের ওপর। এক গভীর দৃষ্টি দিয়ে মেঘের দলকে দেখছেন। হঠাৎই আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘অমন আকাশকে ফিল্মের ভাষায় কী বলে জানো?’ আমরা তিনজনই নিরুত্তর। নিজের করা প্রশ্নের উত্তর এবার নিজেই দিলেন। ‘ক্রোসাস স্কাই’। বললেন, এই ভাষাটি শুনেছিলেন আকিরা কুরোসোয়ার কাছে।

কথায় আর গল্পে অনেকটা সময় আর পথ পার হয়ে আমরা ঢুকে পড়েছি হাওড়া জেলায়। তপনদার মনে পড়ে গেল ‘অতিথি’ ছবির শুটিংয়ের স্মৃতি। কারণ, মহিষাদল রাজবাড়ির পথের খুব কাছ দিয়েই আমরা একটু আগে এসেছি। রবীন্দ্রনাথের

তারাপদ তার সব বন্ধন ছিন্ন করে তপন সিংহের হাত ধরে ঢুকে গিয়েছিল বাঙালির অন্দরে। ‘অতিথি’ ছবি থেকেই তপনদার সংগীত পরিচালনার শুরু।

ভিডিও : শতবর্ষের পথে তপন সিংহ

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, সংগীতের প্রতি কতখানি গভীর ভালবাসা ছিল তপন সিংহের (Tapan Sinha)। নিজেও ভালো গান গাইতেন। তাঁর প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি ছবিতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর খান, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কালীপদ সেন এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপের কাজ করেছিলেন। ‘অতিথি’ থেকে তাঁর শেষ ছবি পর্যন্ত তপন সিংহ স্বয়ং সংগীত পরিচালনার দায়িত্বটি খুব সহজেই নিজের কাঁধে তুলে নেন। ‘সহজে’ শব্দটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করলাম, কারণ তিনি সংগীতের বিষয়টা তিনি বরাবরই খুব ভালো বুঝতেন। কেরিয়ারের একদম প্রথমে শব্দগ্রহণ করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন বহু বছর। সেই সময়ে বিখ্যাত সব সংগীত-শিল্পীদের গান রেকর্ডের কাজ করতেন সুনিপুণভাবে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর একটি বিশেষ ঘরে একটিমাত্র মাইক্রোফোনের মাধ্যমেই কাজটি করতেন। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে যে হারমোনিয়ামটি ছিল সেটি কুন্দনলাল সায়গলের। কবে এবং কীভাবে সেটি তপনদার কাছে এসেছিল, জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের তারাপদ তার সব বন্ধন ছিন্ন করে তপন সিংহের হাত ধরে ঢুকে গিয়েছিল বাঙালির অন্দরে

ছবির সিচুয়েশনের প্রয়োজনে গানও লিখেছেন তপন সিংহ। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতিও ছিল বিশেষ টান। নিজের ছবিতে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের দিয়ে গানও গাইয়েছেন। সেই সব গান গেয়েছিলেন বৈজয়ন্তীমালা, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, চিন্ময় রায় প্রমুখ। ‘গল্প হলেও সত্যি’ ছবির একটি দৃশ্যে তপনদা নিজেই কয়েক কলি গান গেয়েছিলেন। ‘এখনই’ ছবিতে তাঁর রচিত ‘বন্ধু তোমার আশার আশাতে’, ‘অতিথি’-র ‘মাঝে নদী বহে রে’, ‘বাঞ্ছরামের বাগান’ ছবিতে ‘এক অচিন পাখি উড়ে উড়ে এল মনের ভাঙা খাঁচাতে’ ছবির মধ্যে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আজও সেই সব গান শুনলে ভালো লাগে। ‘হারমোনিয়াম’ ছবিতে ছায়া দেবীর কণ্ঠে দুটি গান এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গানকেও তাঁর বিভিন্ন ছবির দৃশ্যে তীক্ষ্ম সুন্দরভাবে পিকচারাইজ করেছিলেন।

সংগীতের বিষয়টা তিনি বরাবরই খুব ভালো বুঝতেন

আবার ‘হারমোনিয়াম’ ছবির কথায় ফিরে যাই। একটি হারমোনিয়ামকে কেন্দ্র করে যে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি হতে পারে, তা না দেখলে ভাবা যায় না। একটা হারমোনিয়ামের ক্রমাগত হাতবদল হচ্ছে আর তাকে কেন্দ্র করে এক-একটি জায়গায় ঘটছে হরেকরকম ঘটনা। সেই ছবিতে কে না গেয়েছিলেন! হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীদের সমারোহ দেখা গিয়েছিল। ছায়াদেবীর কথা তো আগেই বলেছি।

তপনদার আত্মজীবনীর এক জায়গায় পড়েছিলাম তাঁর মা গ্রীষ্মকালে ছাদে তারাভরা আকাশের তলায় শুয়ে গাইতেন— ‘যতবার আলো জ্বালতে চাই’। তপনদার মুখেই শোনা বাংলা-বিহার সীমান্তের কাছে বীরভূমের হিলোরা গ্রামের বাড়িতে পুজোর সময়ে ঢাকের সঙ্গে কাঁসি বাজাতেন তিনি। তাঁর অনেক গুণের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

আবার প্রথম থেকে শুরু হয়ে ছিল সিনেমার শুটিং। কিন্তু ছবি বিশ্বাসের রাজকীয় খামখেয়ালি মেজাজ জুড়ে ছিল সারা ছবিতে। স্পিরিট গাম দিয়ে কিছুতেই দাড়ি লাগাতে চাননি ছবি বিশ্বাস। তাই সারা ছবি জুড়ে কিম্ভুতকিমাকার এক দাড়ি নিয়ে দেখা যায় মিনুর কাবুলিওয়ালাকে। কেন পরিচালক হিসেবে তিনি এ ব্যাপারে জোরাজুরি করেননি এ নিয়ে পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায় খুব বকাবকি করেছিলেন তপন সিংহকে। যদিও ততদিনে ‘কাবুলিওয়ালা’ নিয়ে হইচই পড়ে গেছে গোটা দেশেই। বার্লিন ফেস্টিভ্যালে ছবিটি দেখে এক বিদেশি সাংবাদিক তপন সিংহকে জানিয়েছিলেন, ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয়ে ওঁর দাঁড়ির বিষয়টি নিয়ে সমস্তরকম অভিযোগ উনি ভুলিয়ে ছেড়েছেন। আবার নিজের খেয়ালে এই ছবি বিশ্বাসই কাশ্মীরের শুটিংয়ে কাবুলিওয়ালার কস্টিউম পরে হাজির করেছিলেন সহকারি বলাই সেনকে। অজেয় অভিনেতা ছবিবাবুকে কী বলবেন ভেবে পাননি তপন সিংহ। আজও তাই ওই সিনেমায় বাকি সব অংশের কাবুলিওয়ালা ছবি বিশ্বাস হলেও কাবুলের দৃশ্যে কাবুলিওয়ালা রূপে যাকে দেখা যায় তিনি বলাই সেন। তপন সিংহ পরিচালক হিসেবে এভাবেই অনেকটা ছেড়ে দিতেন সিনেমার কলাকুশলীদের ওপর। আর তাতে প্রতিবারই শাপে বর হত। এই মেজাজি ছবি বিশ্বাসকেই দেখা যায় তপন সিংহের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এ নিজে থেকে এগিয়ে এসে ‘রোল’ নিতে, ওই বয়সেও প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে।

নিজের ভদ্রতার গুণেই তপন সিংহ সেসময়ের তাবড় তাবড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে খুব সাবলীল কাজ করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। ‘সাগিনা মাহাতো’র শুটিং এ অভিনেতা দিলীপকুমারকে নিয়ে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। কোন সিন পছন্দ না হলে নানা টালবাহানা করে তা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করতেন দিলীপকুমার। একদিন সেটে এসে দেখা গেল দিলীপকুমার গ্রিনরুমে বসে আছেন ঘাড়ে ‘হটব্যাগ’ নিয়ে। আতঙ্কিত তপন সিংহ তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন ঘাড়ে ব্যথা, আজ আর হবে না কিছু। একটা গোটা দিন শুটিং ক্যানসেল মানে অনেক টাকার ধাক্কা। বুদ্ধি করে তখন তপনবাবু দিলীপকুমারকে বললেন, ‘ব্যথা তো একটু হবেই। নার্গিস, মীনাকুমারী, বৈজয়ন্তীমালা... কত কত নায়িকা ওই কাঁধে মাথা রেখে অভিনয় করেছে..’। ‘অসুস্থ’ দিলীপকুমার হেসে ফেলে তখন বলেছিলেন, '’বাবা শ্যুটিং করবে চলো,....বাঙালিদের সঙ্গে পেরে ওঠা দায়’। আবার এর উল্টো ঘটনা অভিনেতা অশোককুমারের ক্ষেত্রে। ‘হাটেবাজারে’র সেটে সত্যিই অসুস্থ অশোককুমার হাঁপানি নিয়েও নিজে থেকেই অভিনয় চালিয়ে গেছিলেন। তপন সিংহের অনুরোধেও শ্যুটিং বন্ধ করেননি শুধুমাত্র পরিচালকের কাজের ক্ষতি হবে বলে। নিজের ভেতরকার ভালোত্বর গুণেই সকলের কাছে এভাবেই এত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তপন সিংহ।

বাস্তবের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তপন সিংহের পরিচালনার মূল শর্ত। ‘হুইলচেয়ার’-এ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যাতে ঠিকঠিক এক প্রতিবন্ধীর যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেতে পারেন তার জন্য বনহুগলীতে এক পরিচিত ডাক্তারের কাছে দু-তিন বার তাঁকে পাঠান তপনবাবু। দুর্ঘটনায় ওই ডাক্তারবাবুর দুটি পা'ই বিকল হয়ে গেলেও হুইলচেয়ারে তিনি গোটা হাসপাতাল চক্কর দিতেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এই বিষয়টি রপ্ত করাতেই তপনবাবুর এই উদ্যোগ ছিল। বাস্তব বারবার কথা বলেছে তপন সিংহের ছবিতে। ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’, ‘আতঙ্ক’, ‘অভিমন্যু’র মতো সিনেমা তার প্রমাণ। আজও যখন দিল্লি, উন্নাও, হাসরতে কিংবা ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায় কোণায় প্রায় প্রতিদিন নির্ভয়ারা ধর্ষিত হন, ছিন্নভিন্ন করা হয় মণীষা বাল্মীকিদের শরীরকে, তখনও দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে তপন সিংহের ছবি ‘আদালত ও একটি মেয়ে’। মানুষকে এভাবেই বারবার জীবনের আয়নার সামনে দাঁড় করানো, শিক্ষিত মননকে উস্কে দেওয়া যে নাম তপন সিংহ, আজ তাঁরই মৃত্যুদিন।

5.

চলচ্চিত্র-জীবনে গল্পের মতো তপন সিংহ!

‘কাবুলিওয়ালা’ দেখে প্রচণ্ড রেগে গেলেন সত্যজিৎ রায়!
তত দিনে কিন্তু ছবিটা নিয়ে হই হই পড়ে গিয়েছে সারা ভারতে। পরিচালক তপন সিংহর নামে ধন্য ধন্য করছে সকলে।
তখনই একদিন হঠাৎ সত্যজিতের ফোন পরিচালককে, ‘‘নিজে একজন টেকনিশিয়ান হয়ে এত খারাপ টেকনিকাল কাজ করলেন কী করে?’’
রাগের কারণ শুনে ফোনেই প্রায় হাতজোড় তপনবাবুর।
অসহায়তার কথা কবুল করলেন।
তাতে আরওই ক্ষিপ্ত বহুকালের সুহৃদ সত্যজিৎ, ‘‘এত ভালমানুষ সাজবার দরকার নেই। কাজের সময় কোনও দিন কমপ্রোমাইজ করবেন না।’’
অপরাধ কী?
ছবি বিশ্বাসের মতো অমন মাপের এক জন শিল্পী, কিছুতেই স্পিরিট গাম দিয়ে দাড়ি লাগাতে দিতেন না। ফলে কাবুলিওয়ালার দাড়িটি হয়েছিল প্রায় কদাকার। বার্লিন ফেস্টিভ্যালে ছবিটি দেখে এক বিদেশি সাংবাদিক পরিচালকের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, ‘‘অভিনয়টি এতই ভাল যে, আপনাকে উনি ওঁর দাড়ির ব্যাপারটা ভুলিয়ে ছেড়েছেন।’’
কিন্তু ছবি বিশ্বাসকে বোঝায় কার সাধ্যি!
এমন এমন সব বিশ্বাস ছিল ওঁর, খুব কড়া ধাঁচের মানুষ না হলে, তা থেকে তাঁকে বের করে আনা রীতিমতো ঝকমারি।
‘কাবুলিওয়ালা’-তে আরও দু’বারের কাণ্ড যেমন।
কাকে করবেন ‘কাবুলিওয়ালা’, তখনও ভেবে পাচ্ছেন না তপন সিংহ।
ছবি বিশ্বাস শুনে বললেন, ‘‘কাবলেদের সম্বন্ধে আমাকে একজন অথরিটি ভেবে নিতে পারো। ওদের সঙ্গে অনেক মেলামেশা করেছি।’’
— তা’হলে তো ওদের পুশতু ভাষাও একটুআধটু জানেন। কিছু সংলাপ পুশতুতে দিতে চাইছি।
এ বার যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন ছবি বিশ্বাস। বললেন, ‘‘শুধু শুধু পুশতু-মুশতু আনতে গেলে কেন? বুঝবে কে?’’

— না বুঝলেও চলবে। এতে অভিনয়ের একটা ডায়মেনশন আসতে পারে।

ভেবে বললেন, ‘‘তা ঠিক। একটা কাবলেকে ধরে শিখে নিলেই চলবে। বাদবাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। কেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, মেকআপ, চলাবলা...।’’

— প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে একটা বাড়িতে অনেক কাবুলিওয়ালা থাকে। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। সে মাঝে মাঝে আপনার কাছে যাবে।

এর পরের কাহিনি শোনা যাক তপন সিংহর কাছেই।

এক জায়গায় লিখেছেন, ‘‘সেটটি ছিল মেটিয়াবুরুজের একটা মুসলমান হোটেলের অংশবিশেষ।...আমরা যখন সেট লাইট প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ ছবি বিশ্বাস কাবুলিওয়ালার বেশে প্রবেশ করলেন। চমকে উঠলাম। এ কাকে দেখছি? অতি দরিদ্র মলিন বেশধারী হিং বিক্রেতা কোনও কাবুলিওয়ালা, না সদ্য কবর থেকে বেরিয়ে
আসা স্বয়ং মহম্মদ বিন তুঘলক? মাথায় জরির পাগড়ি। গায়ে সিল্কের আচকানের
ওপর জরির কাজ করা হাতকাটা জ্যাকেট। পায়ে সোনার জরির কাজ করা নাগরা। তখন
আমি তিনশো টাকা মাইনের এক জুনিয়র পরিচালক। আর ছবি বিশ্বাস হলেন সে যুগের অজেয় অভিনেতা।সুতরাং ইগনোর্যান্স ইজ্ ব্লিস কথাটি ভেবে কাজ শুরু করে দিলাম।’’

বিকেল বেলা প্রযোজক অসিত চৌধুরী হাজির। দেখে শুনে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর প্রস্থান। তিন চার দিন বাদে অসিতবাবু মুখ খুললেন, ‘‘দেখুন মশায়, ছবিদাকে ওই ঔরঙ্গজেবের পোশাক ছেড়ে গরিব কাবুলিওয়ালা সাজতে হবে। যতটা
কাজ হয়েছে ফেলে দিন।’’

ঠিক হল দু’জনে মিলে গিয়ে বলা হবে। বেশ ভয়ে ভয়েই ছবি বিশ্বাসের কাছে কথাটা পাড়লেন ওঁরা।

শুনে প্রথমে চমকে উঠলেও পরে অবশ্য যুক্তিটা মেনে নেন তিনি। তখন আবার নতুন করে পোশাক তৈরি। নতুন করে শ্যুটিং।

দ্বিতীয় কাণ্ডটি আরও মারাত্মক।

ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে তপন সিংহ বলেছেন, ‘‘যেমন সুদক্ষ অভিনেতা তেমনি আবার ফাঁকিবাজও ছিলেন।’’

ঘটনাটি অনেকটা সেই ধাঁচেরই বটে।

সে বার শ্যুটিং কাশ্মীরে। শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁওয়ের পথে বেশ কিছু ভেতরে সুন্দর একটা উপত্যকায়। অনেকটাই কাবুলের সঙ্গে মিলে যায় তার গড়ন। নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে শ্যুটিং করে তপন সিংহর শরীর তখন বেশ কাহিল। রোজ রাতে জ্বর আসছে।

শ্যুটিঙের দিন ভোরবেলা ছবি বিশ্বাসকে তিনি বললেন, ‘‘শরীরটা আর দিচ্ছে না। আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আজকেই কাজ শেষ করে নেব।’’

— দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।
তপন সিংহ লিখছেন, ‘‘শ’খানেক ভেড়া ও লোকজন জড়ো করে অপেক্ষা করছি। এমন সময় ওঁরা এলেন। দূর থেকে দেখছি জিপ থেকে কাবুলিওয়ালা নামলেন, কিন্তু তার পর যিনি নামছেন, তিনি কে? স্যুট পরা লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক! কাছে আসতে চমকে উঠলাম, উনি তো ছবি বিশ্বাস! তা’হলে কাবুলিওয়ালা কে? এসেই বললেন, দারুণ জায়গা বেছে নিয়েছ তো! এত সুন্দর জায়গায় কি আর আমার ক্লোজ-আপ নেবে? তাই তোমার সহকারী বলাইকে কাবুলিওয়ালার মেকআপ করালাম। একটু লং-এ ট্রিট করলে কেউ ধরতে পারবে না।’’
তপন সিংহ নির্বাক! বলেন কি ভদ্রলোক! কিন্তু আর তো উপায়ান্তরও নেই। অতএব?
শ্যুটিং হল। ওই বলাইকে দিয়েই!
বলাই বাহুল্য, ছবিতে কাবুলের দৃশ্যে আজও কাবুলিওয়ালা বেশে যাঁকে দেখা যায়, তিনি ছবি বিশ্বাস নন। বলাই সেন।
মানুষ যে কত বিচিত্র হয়! কত বৈপরীত্যে ভরা তার যে আচার-আচরণ!
এই ছবি বিশ্বাসই আবার দেখুন, সম্পূর্ণ অন্য চিত্র তখন।
সময়টা ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর। আউটডোরে যেতে তখন অল্প ক’দিন বাকি। পোস্টমাস্টারের চরিত্রটি তখনও কে করবেন, ঠিক নেই পরিচালক তপন সিংহর।
ছবি বিশ্বাসের কাছে গিয়ে কথায় কথায় বললেন, ‘‘কাকে নিই বলুন তো?’’
উত্তর এল, ‘‘একজনই আছে।’’
— কে?
— তার নাম ছবি বিশ্বাস।
নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তখন।
তপনবাবু বললেন, ‘‘মাত্র দু-তিন দিনের কাজ। রাত বারোটায় ফ্লাইট। সেখান থেকে গাড়ি। আপনার শরীর অত ধকল নিতে পারবে?
— খুব পারবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন?
তখন উনি স্টার থিয়েটার-এ। নিয়মিত স্টেজ করছেন। প্রাণান্তকর পরিশ্রম। তার মধ্যেই তিন দিন ‘ম্যানেজ’ করে কাজ করতে ছুটলেন ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর।

•••

কাবুলিওয়ালা-র মিউজিক করেছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

ছবিতে আফগানিস্তানের দৃশ্য আছে। এ সব জায়গায় যা হয়, তাই-ই মনে মনে ভাবছিলেন তপন সিংহও। ‘অ্যারাবিউন টিউন’ জাতীয় কিছু লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে।

এই ভাবাভাবির মধ্যেই একটা অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে গেল।

রবিশঙ্কর হঠাৎই আফগানিস্তানে ‘কাবুলি রেডিয়ো’-তে বাজাতে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। পরিচালককে বললেন, ‘‘দেখা যাক ওখানে কী পাওয়া যায়?’’

যথাসময়ে রবিশঙ্কর ফিরলেন টেপ রেকর্ডারে ভর্তি পুশতু ভাষার গান নিয়ে। এমন অযাচিত স্বর্গ এত অনায়াসে পেয়ে যাওয়ায় অভিভূত হয়ে যান সকলেই।

সারা রাত কাজ করতেন পণ্ডিতজি। সেই ভোরের আলো না-ফোটা অবধি। চোখ বুজে গুনগুন করতে করতে যখনই সুর খুঁজতেন মৃদু হাসি খেলে যেত তাঁর মুখে।

কোনও দিন এক তিলও মেজাজ খারাপ করতেন না। বারবার হয়তো একই ‘মিউজিক্যাল ফ্রেজ’ দেখাচ্ছেন। যাঁরা বাজাচ্ছেন, তাঁরা কেউই তুলতে পারছেন না।
ক্লান্তিতে ঘেমেনেয়ে একশা পণ্ডিতজি। তাও হাসিটা ধরা ঠোঁটে। চাউনি উদাস।
মুখে শুধু বলতেন, ‘‘আর পেরে উঠছি না কিন্তু।’’

কাজে তার ছাপ ছিল না কোনও।

•••

দিলীপকুমারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাটাও তপন সিংহর কাছে বেশ শোনার মতো।

মানুষ হিসেবে দিলীপকুমার এমনিতেই বেশ অদ্ভুত। অভিনয় যদি তাঁর প্রথম প্রেম হয়, দ্বিতীয় প্রেম খেলা।

রোভার্স কাপে ফুটবল খেলেছেন। ছাত্রজীবনে কলেজে বরাবরের দাবা চ্যাম্পিয়ন। সকালে ব্যাডমিন্টন খেলা ছিল নিয়মিত। বিকেলে ঘুড়ি। ইনিই আবার ঊর্দু ভাষার সুপণ্ডিত। এক সঙ্গে নাকি দুটো ছবিতে কাজ করেননি কোনও দিন।

তপন সিংহ লিখেছেন, ‘‘বদনাম একটাই। শ্যুটিঙের দিন কখন যে তিনি আসবেন, কেউ জানে না। আর সিন যদি পছন্দ না হয়, তা হলে কোনও রকম টালবাহানা করে বিদায় নেবেন। শ্যুটিং আর হবে না। এই ধরনের কথাবার্তা সিনেমা মহলে প্রচলিত ছিল। ফলে ‘সাগিনা মাহাতো’ করার সময় প্রমাদ গুনেছিলাম।’’

কার্শিয়াঙে আউটডোরে প্রথম দিন সকালে চার-পাঁচ ঘণ্টা কাজ করার পর যখন শুনলেন, বিকেলেও আবার কাজ, সহকারী বলাই সেনকে ডেকে বলেছিলেন, ‘‘আমাকে দিয়ে যদি এত কাজ করাও, কালই পালাব বম্বে।’’

বলাই সেন নাকি সবার সঙ্গেই একটু গুরুগম্ভীর চালে কথা বলতেন। দিলীপকুমারকেও তেমন করে বলতে গিয়েছিলেন, ‘‘পরিশ্রম করতে হবে দাদা, নইলে জীবনে কিছু পাওয়া মুশকিল।’’

শোনা মাত্র এক চড় দিলীপকুমারের। বলাইবাবু আর দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ পাননি। তার পর অবশ্য ধীরে ধীরে কাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন দিলীপকুমার। কাজও এগোচ্ছিল তর তর করে। কিন্তু যে দিন কাজ করতে ইচ্ছে করত না, সে দিন তাঁকে দিয়ে কাজ করানো ছিল মারাত্মক ব্যাপার।

এক দিন। শ্যুটিং জোনে সবাই তৈরি। কেবল দিলীপকুমারের দেখা নেই। বেলা এগারোটা নাগাদ অধৈর্য হয়ে বাড়িতে ফোন করলেন তপনবাবু। শোনা গেল, বেরিয়ে পড়েছেন। তবে শরীর খুব খারাপ। শুধু পরিচালকের কথা ভেবেই নাকি আসছেন।

এলেন অল্প পরেই। কিন্তু সোজা গ্রিনরুমে গিয়ে আরামকেদারায় শুয়ে পড়লেন।
কাঁধে গরম জলের ব্যাগ।

আতঙ্কিত হয়ে তপন সিংহ গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর কাছে, ‘‘কী হয়েছে?’’

— বড় ব্যথা।

সত্যিই প্রমাদ গুনলেন তপনবাবু। কিন্তু এর পরেও দমে গেলে চলবে না! একটা গোটা দিন যাওয়া মানে অনেক টাকার ধাক্কা। পরের পর শিডিউল লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া। ফলে যে করে হোক অবস্থা সামাল দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে শুধুমাত্র উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সে দিন শ্যুটিংটা করতে পারলেন তপন সিংহ।

বেশ খানিকটা সহানুভূতি দেখানোর পর বললেন, ‘‘ব্যথা তো একটু হবেই। নার্গিস, মীনাকুমারী, বৈজয়ন্তীমালা... কত কত নায়িকা ওই কাঁধে মাথা রেখে অভিনয় করেছে বলো?’’

এ কথা শুনেই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন এতক্ষণের ‘অসুস্থ’ দিলীপকুমার। মুখে চওড়া হাসি। বললেন, ‘‘চলো বাবা, শ্যুটিং করবে চলো। এখুনি মেকআপ করে নিচ্ছি। বাঙালিদের সঙ্গে পেরে ওঠা দায়।’’

আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেল।

ঠিক উল্টো কাণ্ড অশোককুমারের বেলায়।

•••

পাহাড়ঘেরা একটা ছোট্ট বস্তি নাম শাম্চি। সেখানেই কাজ হবে। এ দিকে কঠিন হাঁপানিতে ধরল অশোককুমারকে।

দু’দিন দু’রাত শোওয়া নেই। ঘুম নেই। বিছানায় বসে বসে একটানা নিঃশ্বাস ফেলছেন। কষ্টটা চোখ চেয়ে দেখা দেখা যায় না। এত করুণ অবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন প্রফুল্ল সেন। তাঁর কাছে খবর গেল। তিনি ডাক্তার মণি ছেত্রীকে পাঠালেন সরকারের নিজস্ব প্লেনে। তাঁর ওষুধেই হাঁপানি কমল। কিন্তু শরীর খুব দুর্বল।

বাধ্য হয়ে ওঁকে বিশ্রাম নিতে বলে অন্যদের নিয়ে কাজ শুরু করলেন তপন সিংহ।

পর দিন ভোর।

কাজে যাবার জন্য সবাই রেডি। হঠাৎ দেখা গেল তৈরি হয়ে বসে আছেন অশোককুমারও।

তপনবাবু দেখেই আঁতকে উঠলেন, ‘‘আরে, এ কী! আপনার তো বিশ্রাম নেওয়ার কথা!’’

উত্তরে অশোককুমার বললেন, ‘‘সবাই কাজ করবে, আর আমি হাঁ করে বসে থাকব? হয় কাজ করতে দাও, নইলে বম্বে ফেরত পাঠাও।’’

নাছোড় অশোককুমার কোনও কথা শুনবেন না। ফলে কাজ করতে দিতেই হল ওঁকে। ধীরে ধীরে সেরেও উঠলেন তিনি।

অশোককুমার মানুষটি ছিলেন এমনই!

এর আগেরই ঘটনা যেমন। ওই ছবিতেই বৈজয়ন্তীমালাকে পরিচালকের নেওয়ার ইচ্ছে।
এক বার সে কথা শুনে অশোককুমারই টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেন তপন সিংহর।

বৈজয়ন্তীমালা আবার বাংলা জানতেন না। তপনবাবু তাই অন্য বুদ্ধি করলেন।
সংলাপগুলো তিন ভাবে রেকর্ড করে পাঠান তাঁকে। স্লো স্পিড। মিডিয়াম।
নর্মাল। তাই শুনে শুনে সংলাপ মুখস্থ করেন বৈজয়ন্তী।

•••

উত্তমকুমারের সঙ্গে প্রথম কাজ ‘উপহার’-এ। ’৫৪ সাল।

মহানায়ক হওয়া থেকে অনেক দূরে। কিন্তু নায়ক হিসেবে তখন তিনি ক্রমেই উঠছেন।

এমন সময় তপন সিংহর ডাকে একটি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করলেন উত্তমকুমার। এক তরুণ অধ্যাপকের চরিত্র।

— চিত্রনাট্য আমার খুব ভাল লেগেছে তপনদা।

শুনে তপনবাবু বললেন, ‘‘তোমার যদি মনে হয়, সংলাপের কিছু কিছু জায়গা বদল করে নিয়ো। অভিনয় আর ডায়লগ ব্যাপারটা তো একদম আলাদা, তাই বলছি।’’

এ কথায় খুব খুশি হয়েছিলেন উত্তমকুমার। বলেছিলেন, ‘‘তোমার কাছে প্রথম শুনলাম জানো! সব ডিরেক্টর যা ডায়লগ লেখে, সেটাকেই বলতে বলে। এতে কি অভিনয় হয়, বলো?’’

‘উপহার’-এর পর খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায় দু’জনের। যত বার একে অন্যের সঙ্গে মোলাকাত করেছেন কোথায় যেন আস্থার জমিটা পোক্ত হতে হতে গিয়েছে।

ভাল বিদেশি ছবি দেখলেই উত্তমকুমারকে তপনবাবু বলতেন, ‘‘যাও যাও দেখে এসো।’’

মার্লন ব্র্যান্ডোর ‘গডফাদার’ এল। তাঁর ‘তপনদা’র কথায় দেখে এলেন উত্তমকুমার।

পর দিন কোনও এক ছবির শ্যুটিং। গেছেন স্টুডিয়োয়। সে সময়ই কোনও এক কাজে তপন সিংহও গিয়েছেন সেখানে। তাঁকে দেখে উত্তমকুমার ছিটকে বেরিয়ে এলেন ফ্লোর ছেড়ে, ‘‘দূর দূর শ্যুটিং-ট্যুটিং হবে না এখন। চলো তো তোমার ঘরে গিয়ে বসি। ওফ্ কী ছবি দেখলাম!’’

‘ঝিন্দের বন্দি’ করবেন তপন সিংহ। এ বার নায়ক উত্তমকুমার। ছবির কাজ শুরু করার আগে তাঁর নায়ককে বললেন, ‘‘তোমাকে একটু ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে।’’

উত্তমকুমার শুনে বললেন, ‘‘জানতাম, জানো। অনেক দিন চড়ি না, এই যা। প্র্যাকটিস করতে হবে।’’

ব্যবস্থা করে দিলেন পরিচালক। ভোর পাঁচটায় উঠে ময়দানে ঘোড়া চড়তেন তাঁর নায়ক। একেবারে নিয়ম করে। সে যত কাজই থাকুক। তাতে ফলও মিলল হাতেনাতে।

শ্যুটিং-এর সময় তাঁকে দেখে তপন সিংহর মনে হয়েছিল, এ নায়ক উত্তমকুমার নয়, পোড়খাওয়া কোনও এক ঘোড়-সওয়ার।

ছবির জন্য তরোয়াল খেলাও শিখতে হবে। তাতেও রাজি হলেন নায়ক। ম্যাসি টেলর বলে একজন বিদেশিকে আনলেন তপন সিংহ। অলিম্পিক বিজয়ী।

চেয়ারে বসে ম্যাসির অসিচালনা দেখে দেখে তাঁকে হুবহু কপি করে ফেললেন নায়ক।
পরিচালক তো বটেই, চমকে গিয়েছিলেন স্বয়ং ম্যাসিও।

‘ঝিন্দের বন্দি’র সঙ্গীত করেছিলেন উস্তাদ আলী আকবর খান। সেখানেও একটি বেশ কষ্টকর সঙ্গীত-বিন্যাসকে রীতিমতো কসরত করে তাঁর নায়কের ধরার ভঙ্গিতে হতবাক হয়ে যান পরিচালক।

হঠাৎ তপনবাবুর মনে হয়েছিল, মদ্যপান করলে অনেক সময় যেমন লোকে ভুলভাল বলে, গানেও যদি সে রকম রাখা যায়।

উস্তাদকে বলতেই আলী আকবর বললেন, ‘‘ভারী ভাল ভেবেছেন তো! আমি তৈরি করি।’’

সুর হল। কোনও একটি রাগ নয়, রাগের সমাহার। এক রাগ থেকে অন্য রাগে চলে যাচ্ছে সুরের চলন।

গাইতে ডাকা হল প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রেকর্ডিং হল। উত্তমকুমার সবটা শুনে বললেন, ‘‘তুমি আমায় রেকর্ডিংটা দাও। আমি বাড়িতে রেওয়াজ করি।’’

এ বারও যেন ম্যাজিক দেখলেন তপন সিংহ, তাঁর নায়কের কাছে।

ফ্লোরে যখন এলেন উত্তমকুমার, এতটাই তৈরি যে, প্রথম টেক-এই ওকে! ক্যামেরার ও পাশে দাঁড়িয়ে তখন কথা সরেনি পরিচালকের মুখে।

উত্তমকুমারের ‘স্ত্রী’ রিলিজ করল। গেলেন তপন সিংহ। দেখে উত্তমকে বললেন, ‘‘খুব ভাল অভিনয় করেছ।’’

সেই শুনে নাকি থমকে গিয়েছিলেন উত্তমকুমার, ‘‘তুমিও এ কথা বলছ?’’

— কেন গো?

— দেখলে না, আগাগোড়া ছবিদাকে (বিশ্বাস) নকল করে গেলাম। জমিদারের রোল করছি, ছবিদা ছাড়া তো আর উপায় নেই।’’

আরেক বারের কথা।

সে বার ছবি প্রযোজনা করবেন ঠিক করেছেন উত্তমকুমার। পরিচালনা করার আব্দার নিয়ে গেলেন তপন সিংহর কাছে।

তখন সুবোধ ঘোষের ‘জতুগৃহ’ কাহিনিটা মাথায় ঘুরছে তপন সিংহর। গল্পটা ওঁকে পড়ার কথা বললেন। উত্তর এল, ‘‘আমি কী পড়ব তপনদা! ও তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই করবে।’’

এতটাই বিশ্বাস, এতটাই বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওঁদের।

উত্তমকুমার এমনও এক বার বলেছিলেন ওঁকে, ‘‘তপনদা, আমি তো ভবানীপুরের রকে আড্ডা মেরে বড় হয়েছি, উচ্চারণ খুব একটা ভাল নয়। ছবিদার মতো মার্জিত ডায়লগ বলতে পারি না।’’

তারও নাকি দাওয়াই বলে দিয়েছিলেন তপন সিংহ।

‘‘রোজ সকালবেলা একটা করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করবেন।’’

অক্ষরে অক্ষরে নাকি এ পরামর্শও মেনে চলতেন তাঁর নায়ক।

এমন একটা ভরসার সম্পর্কে কোথায় যেন তাল কেটে গেল ‘বাঞ্ছারামের বাগান’ করতে গিয়ে।

চ্যালেঞ্জিং রোল। কোনও দিন অমন চরিত্র করেননি। সানন্দে রাজি হলেন উত্তমকুমার। ডেটও দিলেন। শ্যুটিং-শিডিউল সে ভাবেই ঠিক হয়ে গেল।

কিন্তু তার পরে কী যে হল!

তপন সিংহ লিখেছেন, ‘‘হঠাৎ ডেট বদলাতে চাইল উত্তম। বম্বেতে কী একটা হিন্দি ছবির কথা চলছিল। ওই ছবির জন্য আমাকে দেওয়া ডেটগুলোর দরকার হয়ে পড়ল! পরের মাসে শ্যুটিং করতে চাইল...ওকে বললাম, হতে পারে অন্যরা ছোট আর্টিস্ট। কিন্তু তাঁদেরও তো একটা সম্মান আছে। পরের মাসে শ্যুটিং করা যাবে না। তুমি বরং ছবিটা ছেড়ে দাও।’’

এর পর সব চুপচাপ। একটা ঠান্ডা ঝড় এত দিনের একটা সম্পর্ককে ছারখার করে দিল!

উত্তমকুমারের জায়গায় দীপঙ্কর দে-কে নিলেন তপনবাবু। শ্যুটিং করে কলকাতায় ফিরে শুনলেন সুপ্রিয়া চৌধুরী মামলা করেছেন।

সে-মামলা অবশ্য ধোপে টিকল না। আসলে ছবিতে সময়টা দেখাতে চেয়েছিলেন শীতকাল। সেই অনুযায়ী বাগানে ফলমূল, সবজি লাগিয়েছিলেন। অপেক্ষা করলে তা শুকিয়ে যেত। এই কথটাটা ঠারেঠোরে লেখা ছিল চুক্তিপত্রে। তাই মামলায় হেরে যান উত্তমকুমার। কিন্তু সম্পর্কে সেই যে চিড় ধরল, সে আর ফেরেনি।

পরে বহু দিন তপনবাবু ভেবেছিলেন, সব মিটিয়ে নেবেন। হয়ে ওঠেনি। আর তার পরেই তো সব শেষ। সমস্ত জাগতিক সম্পর্কের ইতি টেনে চিরকালের জন্য চলে গেলেন মহানায়ক।

নিথর উত্তমকে শেষ দেখা দেখতে গিয়ে ভাই তরুণকুমারের সঙ্গে দেখা। তপনবাবুর হাতটা ধরে তরুণকুমার বলেছিলেন, ‘‘দাদাও খুব চেয়েছিল, সম্পর্কটা আবার ফিরে আসুক। খুব দুঃখও করত এ নিয়ে। একটা ছবি করতে গিয়ে এত দিনের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল!’’

হারিয়ে যাওয়া বন্ধুত্বর শোক যেন তখন দ্বিগুণ হয়ে বিঁধে গিয়েছিল বুকে।

‘ঝিন্দের বন্দি’ করার সময় ঘোড়া চড়ার অভ্যাস করান সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কেও। সে ’৬০-’৬১ সালের কথা।

তার পর প্রায় পঁচিশ বছর কোনও কাজে ডাকেননি সৌমিত্রবাবুকে। এক সময় নিজেই আপসোস করতেন এ নিয়ে।

বলতেন, ‘‘ও যে নিজেকে কতটা পরিণত করেছে, জানাই ছিল না আমার। টের পেলাম ‘আতঙ্ক’ করতে গিয়ে।...সঞ্জীবকুমার যেমন ধরনের অভিনেতা, সৌমিত্র
ঠিক তেমনই। কিংবা তার চেয়ে বেশি বলে আমার মনে হয়।’’

সৌমিত্রবাবুকে নিয়ে ‘হুইলচেয়ার’ করার সময় আরেক ধরনের অদ্ভুত তালিমের কথা বলেছিলেন তপন সিংহ।

বলেছিলেন, ‘‘তোমাকে অন্তত এক মাস হুইল চেয়ারে বসে ঘুরে বেড়ানো রপ্ত করতে হবে।’’

বনহুগলিতে এক পরিচিত ডাক্তার ছিলেন, দুর্ঘটনায় তাঁর পা দুটি বিকল হয়ে যায়। হুইলচেয়ারে বসেই তিনি গোটা হাসপাতাল চক্কর দিতেন। এমন এক জন ব্যস্ত

মানুষ কী করে এই ব্যাপারটা করেন, দেখতে চেয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও। দু-তিন বার তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওঁকে।

•••

‘ঝিন্দের বন্দি’র শেষটা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনির থেকে বদলে দিয়েছিলেন তপন সিংহ। পরে এ নিয়ে আক্ষেপ করতেন। তারই কাছাকাছি আক্ষেপ ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিয়ে ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’ ছবিটিকে ঘিরে।

‘হাঁসুলি...’ সিনেমা হবে শুনে তারাশঙ্কর অসম্ভব খুশি হয়েছিলেন। তা নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন, রীতিমতো অদ্ভুত।

মূল কাহিনির পটভূমি ছিল বীরভূমের লাভপুর। তপন সিংহকে নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন সেখানে।

মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। লোকেশন দেখে বেড়াতেন। অন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তারাশঙ্করের ক্লান্তি নেই। চোখের দৃষ্টি যেন মাঝে মাঝে দিগন্ত ছাড়িয়ে কোথায় উধাও হয়ে যেত। ধ্যানমগ্ন ঋষি যেন!

এক বার বলেছিলেন, ‘‘জানো তপন, এই লাভপুরের আশেপাশে পাঁচ-ছখানা গ্রামে ক’খানা গাছ আছে, তা’ও বলে দিতে পারি আমি।’’

সেই কোপাই নদী। গাঁ-ঘর। তার লোকজন। এমনকী করালীর পিসতুতো ভাই নসুবালা, যে মেয়ে সেজে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, তাকেও চিনিয়ে দিয়ে ছিলেন তারাশঙ্করই।

দিনের শেষে কাজের পর লাভপুরের বাংলোয় বসে মহাভারতের গল্প শোনাতেন তারাশঙ্কর।

তেমনই এক দিন।

তপন সিংহ লিখছেন, ‘‘হঠাৎ এক জন বৃদ্ধা এসে তাঁকে প্রণাম করল।...‘কেরে নসু নাকি... আয় আয়।’ সাদরে আহ্বান জানালেন তারাশঙ্কর। ‘হ্যাঁ বাবু, ভাল আছেন তো?’ বৃদ্ধাটি বলল। কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে কেমন যেন মনে হল। তারাশঙ্কর আমার দিকে দেখিয়ে বললেন, ‘এই যে এই বাবু এসেছেন, তোদের নিয়ে সিনেমা করতে।’ আমার দিকে চেয়ে বললেন, ‘এ হচ্ছে হাঁসুলিবাঁকের উপকথা-র নসুবালা। এ বার ভাল করে দেখলাম— যাকে বৃদ্ধা ভেবেছিলাম সে আসলে একজন পুরুষ।.... নসুবালা নাচে, গান গায়, তামাক খায়, মদ খায়, ঢোল বাজায়।... হঠাৎ তারাশঙ্কর বললেন, ‘এই নস্যে, বাবুকে একটা গান শোনা।’ কানে এক হাত দিয়ে দু’বার গলা খাঁকারি দিয়ে নসুবালা শুরু করলে— ‘আহা—আমায় এ হিদি মাঝারে আঁকা হয়ে গেলা শ্যামের চরণখানি।’’’ নসুকে এত কাছ থেকে দেখেও সিনেমায় তাকে ‘মেয়ে’ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তপন সিংহ। পরে ভুল বুঝেছিলেন। তখন আপসোসের অন্ত ছিল না!

‘হাঁসুলি বাঁক...’ করতে গিয়ে অদ্ভুত ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন রবি ঘোষকে। এলটিজি-র ‘অঙ্গার’ নাটকে তখন অভিনয় করছেন রবি ঘোষ। এর পর তাঁকে ‘নির্জন সৈকত’-এও নিলেন। ওড়িশাবাসী এক পাণ্ডার চরিত্রে। সে অভিনয় এতই জীবন্ত যে,

শ্যুটিং-এর সময় রেলস্টেশনে পাণ্ডারাই ধোঁকা খেয়ে গিয়ে রবি ঘোষকে এই মারে তো সেই মারে!

এর পরেই ওঁকে নিয়ে তপন সিংহর অন্যতম সেরা চমক ‘গল্প হলেও সত্যি’। উত্তম-সুচিত্রার গ্ল্যামারের ভিড়েও যা আজকের কথায় প্রায় ‘ব্লকবাস্টার’ হয়ে গেল! এ ছবিতে আবার গানও গাইলেন তপনবাবু।

•••

সাহিত্যিক বনফুল থাকতেন ভাগলপুরে। তিনি তখন ওখানকার নামকরা ডাক্তার-প্যাথোলজিস্ট।

তপনের শৈশব-কৈশোর কেটেছে ওই ভাগলপুরেই। কিন্তু তখন গম্ভীর প্রকৃতির সেই মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস হয়নি।

প্রায়ই দেখা যেত লাঠি হাতে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে, ধুতিটা লুঙ্গির মতো পরে নিজের ল্যাবরেটরিতে চলেছেন বনফুল।

অনেক পরে সেই বনফুলের ছোট গল্প ‘অর্জুন কাকা’-কে নিয়ে ছবি করার খুব ইচ্ছে হল।

ভয়ে ভয়ে চিঠি লিখে ফেললেন ভাগলপুরে। উত্তরও এল। তাতে লেখা, কোনও এক কাজে কলকাতায় আসছেন বনফুল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ তাঁর ছেলের ফ্ল্যাটে দেখা করতে হবে।

জড়সড় হয়ে দুরু দুরু বুকে গেলেন সে-ফ্ল্যাটে। দেখা হল। কিশোরবেলায় দেখা বনফুলের সেই গাম্ভীর্য ভাবটা তখন কই!

বনফুল বললেন, ‘‘কথা পরে হবে। আগে ভাগলপুর থেকে আম এনেছি, জর্দালু আম, একটু খেয়ে নাও। এ রকম আম কলকাতায় আর কোথায় পাবে?’’

এই এক কথাতে ভয়ের প্রাচীরটা যেন ভেঙে গেল।

‘অর্জুন কাকা’ নিয়ে ছবি হবে শুনে তার নামও ঠিক করে দিলেন বনফুল—‘আরোহী’।

চিত্রনাট্য আগে শোনাতে চাইলে হেসে বললেন, ‘‘কিছু দরকার নেই। মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাও।’’ টাকাপয়সা নিয়ে একটি কথাও বললেন না।

ছবি তৈরি হল।

কিন্তু মুক্তি নিয়ে নাটকীয় কাণ্ড!

রিলিজের আগে পশ্চিমবঙ্গের সব প্রেক্ষাগৃহের কর্মীরা হরতাল ডেকে বসলেন।
খবরটা কানে যেতেই তপনবাবু ধরেই নিয়েছিলেন ছবির দফারফা! কিছুতেই আর রক্ষা পাওয়ার নয়।

ছবির মুক্তি পাওয়ার কথা মিনার-বিজলী-ছবিঘরে। তার আগে ছবিটা এক বার চালিয়ে শব্দ আর প্রজেক্টরের আলো প্রিন্ট অনুযায়ী ঠিক করা হবে।

মুক্তির ঠিক দু’দিন আগের কথা। শূন্য হলে তপন সিংহ আর তাঁর কিছু সহকর্মী বসে।

ছবি চলল। ওঁরা দেখলেন। সবার অজান্তে ইউনিয়নের কিছু লোকও দেখলেন। সেই যাঁরা হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবি শেষে তাঁরা এত খুশি যে, হরতাল কিছু দিনের জন্য বন্ধ রেখে দিলেন।

বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কবে ঘটেছে, জানা নেই।

•••

’৭০ সালের পর বেশ কিছু হিন্দি ছবি করেছেন তপন সিংহ। ‘সাগিনা মাহাতো’-র হিন্দি। ‘ক্ষণিকের অতিথি’-র হিন্দি ‘জিন্দেগী জিন্দেগী’, ‘সফেদ হাতি’, ‘আজ কা রবিনহুড’, ‘এক ডক্টর কী মওত’, ‘আনোখা মতি’। সেখানেও কারা না কারা সব অভিনয় করলেন— সায়রা বানু-ওয়াহিদা রহমান-শাবানা আজমি...।

’৭৮-এ ‘সফেদ হাতি’ তৈরির সময় সে আরেক অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড।

গল্পের নায়ক ঐরাবত নামে একটি শ্বেত হস্তি। অতএব সাদা হাতি চাই-ই চাই। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তেমন হাতি?

রেওয়াতে নাকি সাদা বাঘ আছে। লোকমুখে শোনা গেল, সেখানে সাদা হাতিও পাওয়া যায়।

পরে খবর নিয়ে জানা গেল, বাজে কথা। কারা যেন বলল, বর্মায় সাদা হাতি পাওয়া যায়। সেটিও বাজে কথা।

এর পরও হাতি কিন্তু ছবিতে সাদাই। কী করে এমনটা সম্ভব হল। রহস্য!

তবে সমাধানটি হয়েছিল অতি সহজে। একটি বিখ্যাত রঙের কোম্পানি এক বিশেষ ধরনের সাদা রং তৈরি করে দিয়েছিলেন। যা দিয়ে হাতিকে রং করলেও তার শরীরের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়।

সাদা হাতির সমস্যা তো মিটল।

কিন্তু একটি ঝুঁকিপূর্ণ দৃশ্যের শ্যুটের সময় ঘটে গেল অদ্ভুত কাণ্ড।

ছবিতে একটি দৃশ্যে দেখানো হবে শিশু অভিনেতা শিবু গভীর জঙ্গলে হেঁটে যাচ্ছে, এমন সময় একটা চিতা বাঘ তার পিছু নেবে। হঠাৎ শিবুর নজরে আসে

চিতাবাঘ তার পিছনে। সে প্রাণপণে দৌড়তে থাকে। চিতাবাঘও তার পিছনে পিছনে ছোটে।

শ্যুটিং-এর জন্য ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলে ঢোকা শুরু হল। একটু বাদেই বিরাট হুঙ্কার। ফরেস্ট গার্ড হেসে বললেন, ‘‘বুনো হাতি! আমাদের এগোতে বারণ করছে।’’

শুনে ইউনিটের লোকজনের বুক শুকিয়ে কাঠ।

তখনও কি জানা ছিল, আরও চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটতে চলেছে একটু বাদেই।

শ্যুটিঙের জন্যই খাঁচায় রাখা ছিল দুটো চিতা বাঘ। তার মধ্যে একটি আবার বেশ ‘দুষ্টু’। শিশু অভিনেতার বয়স মাত্র সাত-আট বছর। তার সঙ্গে চিতার শ্যুটিং।
যথেষ্ট ভয়ের। তার ওপর একটা দৃশ্য আছে, যেখানে চিতাটা শিবুর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্যামেরা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে চিতাটাকে রাখা হল। শিবু বিশ গজ দূরে। দুজনেই ক্যামেরার দিকে ছুটবে, এই আশায়। ক্যামেরা চলল। ইশারায় চিতাকেও ছাড়া হল। চিতা এক বার এ দিকে তাকাল। তার পর ও দিকে। হঠাৎ লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে এক বিরাট লাফ। সোজা গভীর জঙ্গলে ধাঁ। আর তাকে ফেরানো যায়নি।

‘আজ কা রবিনহুড’ করতে গিয়ে তো প্রাণেই মারা পড়ছিলেন। হাতির লাথি খেয়ে পাঁজর ভাঙল। তার পরও হাতিটা ছাড়েনি ওঁকে। পিষে মেরে ফেলার চেষ্টায় ছিল। কোনও ক্রমে বাঁচিয়েছিল মাহুত।

এমন এক বর্ণময় জীবনের শেষকালটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। স্ত্রী অরুন্ধতী চলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই।

এক সময় ছেলে রানা এলেন বিদেশ থেকে। তার স্ত্রী রয়ে গেলেন ও-বাড়িতেই। ছেলে যাতায়াত করতে লাগলেন।

এর মাঝেই ‘দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড’, স্বাধীনতার ষাট বছরে ‘লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’...! পুরস্কার, সম্মান, তখন তাঁর জীবনে কতটুকু!

নিউ আলিপুরের তিন তলা বাড়িতে তখন তিনি প্রায় বন্দিই। শ্বাসের সমস্যা তো ছিলই। পেসমেকার বসানোর পর অদ্ভুত এক সমস্যা দেখা দিল। শরীর নিতে পারছিল না যন্ত্রটা। ভীষণ একা লাগত। পুরনো ছবি, পুরনো কথা ঘুরে বেড়াত চারপাশে। নিউ থিয়েটার্স... পঙ্কজ মল্লিক... রাইচাঁদ বড়াল... বিমল রায়ের সঙ্গ...! আর শৈশবের ভাগলপুর...।

যে এক-দু’জন মাঝে মাঝে আসত-যেত তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন ছেঁড়া ছেঁড়া সেই স্মৃতির খেয়া।

সে সময়েরই এক সাক্ষাৎকারে এক বার বলেছিলেন, ‘‘এখন কী ভাল লাগে জানো, বিকেলবেলা একান্তে বসে শুধু ‘গীতবিতান’-এর পাতা উল্টে যেতে। বারান্দায় বসে গীতবিতানের গান গুনগুন করি। কোনওটায় সুর আসে, কোনওটায় আসে না।...এখন যে রবীন্দ্রনাথই আমার আশ্রয়।’’